OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 94
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 751 - 756
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 751 - 756
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

লোক-মন্ত্র ও অন্ধবিশ্বাসের গল্প : উত্তর দিনাজপুরের ওঝালি প্রথা এবং তারাশঙ্করের ‘ডাইনী’

সৌম্য দেব দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: saijyadebdas94@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
North Dinajpur, Folk-mantra, Ojhali tradition, Tarashankar Bandyopadhyay, Daini (The Witch), Blind faith, Sordhoni.

Abstract
This essay presents a comparative and psychological analysis of the folk Ojhali tradition of North Dinajpur and Tarashankar Bandyopadhyay’s timeless story, ‘Daini’ (The Witch). In the rural settlements of North Bengal, incantations and rituals are not merely superstitions; rather, they function as an inevitable psychological assurance parallel to modern science. Drawing upon the theoretical discussions of researchers Subhash Mistry and Pallab Sen Gupta, this work examines the practical characteristics of mantras used for venom extraction, body-protection (Dehabandha), union, and separation as prevalent in the regional dialects of North Dinajpur. On the other hand, it illustrates how this same mantra-based blind faith pushes Sordhoni or Sora, the central character of Tarashankar’s ‘Daini’, into a lonely and cursed life. When Sora’s suppressed motherhood and youthful memories are transformed into the predatory instincts of a ‘witch’ in the eyes of society, it gives birth to a formidable tragedy. Ultimately, Sora’s death in a Kalbaishakhi (Nor'wester) storm being identified by society as the result of a sorcerer’s (Gunin) incantatory strike highlights the predatory grasp of superstition. This conflict between the rich heritage of folk culture and social malady is the primary theme of this essay.

Discussion

বাঙালির লোকসংস্কৃতি কেবল গান বা নাচ নয়, এর এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস কখনও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার কখনও ঠেলে দেয় ধ্বংসের মুখে। উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই বিশ্বাস আজও ডালপালা মেলে আছে তার বিচিত্র সব ‘মন্ত্র’ নিয়ে। লোক-গবেষক সুভাষ মিস্ত্রী মন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তিনি বলেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 94
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 751 - 756
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সকল জীব বা প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বিষয়ের রহস্যময় অথবা উদঘাটিত, অচিন্ত ও অমোঘশক্তি যা গোপনে বা নিভৃতে অনুশীলন বা সম্পাদন যোগ্য, জপ্য, উচ্চারিতব্য ইষ্ট প্রতীক বা গূঢ়ার্থক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ অথচ দ্রুত অভিষ্ট সিদ্ধির পরিপূরক বা পরিচায়ক, তাহাই মন্ত্র।"[১]

এই যে অমোঘ শক্তির কথা বলা হয়েছে, এটিই পল্লী-সমাজের চালিকাশক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান যখন হাসপাতালের দোরগোড়ায় মানুষকে পৌঁছে দেয়, পল্লীর মানুষ তখন আজও ওঝা বা মাহাতের কাছে ছুটে যায় একধরণের মানসিক নিশ্চয়তা পেতে। লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেন গুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

> "আজও নানাজন নানাভাবে মনের গুপ্তকোণে শহরবাসী, আদিবাসী, বর্ণশ্রেষ্ঠ বা বর্ণহিন্দু সর্বস্তরের মধ্যে এর প্রভাব অল্পবিস্তর কাজ করে চলেছে।"[২]

এই গুপ্তকোণ শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের অবচেতন মনের সেই আদিম ভয়, যা থেকে মুক্তি পেতে আমরা অলৌকিকতার আশ্রয় নিই।

উত্তর দিনাজপুরের লোক মন্ত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোর ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ মেনে চলে না। এটি মূলত তদ্ভব, দেশি এবং আঞ্চলিক কামতাপুরী বা রাজবংশী ভাষার এক মিশ্র রূপ। কুঞ্জ মোহন দাসের সংগৃহীত মন্ত্রগুলো আমাদের দেখায় যে, ওঝারা মূলত দুইধরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করেন– মঙ্গলের উদ্দেশ্য এবং অমঙ্গলের উদ্দেশ্য—

১. আরোগ্য ও সুরক্ষার মন্ত্র : গ্রাম্য জীবনে সাপের কামড় বা শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ওঝাদের ডাক পড়ে। বিষ দূর করার জন্য তারা যে মন্ত্র পড়ে, তাতে যেমন হিন্দু দেবদেবীর নাম আছে, তেমনি আছে মুসলিম পীরদের দোয়া। এক অদ্ভুত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন এই মন্ত্রের ছত্রে ছত্রে মিশে আছে—

> "লালবানু থালবানু কায়া বৃক্ষা সতিপুর বিষ পাতালে যা, আগেকার হনুমান বীর লহ একটা তীর লৌহা ঈশ্বর মান পার্বতী হামারে ঝান বড় পীরসাহেবর দুয়া পাতালে যা।"[৩]

এখানে হনুমান বীর এবং পীরসাহেব দু'জনেই সমান্তরালভাবে বিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এটি কেবল একটি মন্ত্র নয়, তা মানুষের শরীরের যন্ত্রণাকে পাতালপুরীতে পাঠিয়ে দেওয়ার এক মনস্তাত্ত্বিক আকুতি। আবার শরীরকে অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে 'দেহাবন্ধ মন্ত্রের' গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ বিশ্বাস করে, শরীর যদি লৌহার জালে বন্দি থাকে, তবে কোনো অপশক্তি তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

> "লৌহার জাল লৌহার খুটি আজি শরীরটা বন করনু চারচপ্পর রাতি, আজিকার দুপহর বেলা কালিকার বেলাভাটি যাপতোক নিহবে ঈশ্বর ঠাকুরের পূজা তাপতক রইবো বন রইবো বন।"[৪]

এখানে 'বন করা' মানে হল সুরক্ষা কবচ তৈরি করা। এই বিশ্বাসের জগৎটিই মানুষের মনে একধরণের স্থিরতা আনে।

২. প্রেম, মিলন ও বিচ্ছেদের মনস্তত্ত্ব : মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি হলো ভালোবাসা। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাত হয় বা সামাজিক বাধার মুখে পড়ে, সেখানেই আবির্ভাব ঘটে 'মিলন মন্ত্রের'। উত্তর দিনাজপুরের ওঝারা 'ফেন্না' (পুরুষ) ও 'ফেন্নি'র (নারী) মিলন ঘটাতে মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

> "আজলে কালিমা কাজলে তুই ডাইন হাতে ওড়ের ফুল কালিমাবুল এই তেল পড়াইয়া দেমোক ফেন্নির সঙ্গে ফেন্নার মিলন করিয়া দেয়, মোর কাথা হেলবো দুলবো মা ঈশ্বর জগতের মাথা মুছিবো দুই পা।"[৫]

এই মন্ত্রের প্রয়োগ কেবল প্রেমিকার মন পেতেই নয়, তা মা ঈশ্বর জগতের মাথা—অর্থাৎ পরম শক্তির দোহাই দিয়ে অন্যের ইচ্ছাকে নিজের অধীনে আনার এক চেষ্টা। তবে যেখানে মিলন আছে, সেখানে হিংসার বশবর্তী হয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর মন্ত্রও সমাজ-বাস্তবতায় উপস্থিত—

> "তেলে আগল তেলে পাগল তেলের নাম জয়মঙ্গল এই তেল নাড়িয়া ফেন্নাক আন ধরিয়া ছাড়ো ফেন্না ফেন্নির পাশ ফেন্নাক ধরে করো স্বর্গবাস, এই তেল হেলবো ফেলাবো মা ঈশ্বর জগতের মাথা মুছিবো দুই পা।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 94
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 751 - 756
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই মন্ত্রটি সেই বিরূপ মনস্তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

উত্তর দিনাজপুরের এই মন্ত্রের জগতটি যদি হয় বিশ্বাসের মুদ্রার এক পিঠ, তবে অন্য পিঠটি হলো তারাশঙ্করের ‘ডাইনী’ গল্প। যেখানে মন্ত্রের শক্তি মানুষের উপকারের বদলে হয়ে ওঠে এক মারণাস্ত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোরধনি বা সরা কেবল একজন বৃদ্ধা নয়, সে হলো সমাজের সেই অশুভ তকমার জীবন্ত দলিল। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি, সমাজ কীভাবে একাকী এক বৃদ্ধাকে ডাইনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উত্তর দিনাজপুরের লোক-বিশ্বাসে যেমন দেহাবন্ধ মন্ত্র অশুভ শক্তিকে আটকায়, এখানে সমাজ তেমনই সরাকে এক অদৃশ্য ঘেরাটোপে আটকে রেখেছে। তার প্রতি মানুষের ঘৃণা এতই তীব্র যে, তারা তার মৃত্যু কামনা করে। সরা নিজেও একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার ভেতরে সত্যিই কোনো রাক্ষসী বাস করে। লেখক লিখছেন—

> “ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশু-দেহের রস 'অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!”[৭]

এখানে লোক-বিশ্বাসের সেই বীভৎস শোষণ চিত্র ফুটে উঠেছে। উত্তর দিনাজপুরের মানুষ যেমন মনে করে বিষ পাতালে যা, গ্রামের মানুষও তেমনই মনে করে সরার চাহনি বা বাণ মানুষের প্রাণ শুষে নিতে পারে। কিন্তু এই গল্পের ট্র্যাজেডি হলো, এই ডাইনী তকমার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক বিরহী নারী। সরা যখন রাতের বেলা ঝরনার ধারে বাউরী ছেলে আর স্বামী-পরিত্যক্তা উজ্জ্বলার গোপন প্রেমলাপ শোনে, তখন তার অবদমিত যৌবনের স্মৃতি জেগে ওঠে। সে হিংসা করে না, উপরন্তু তাদের মিলন ঘটাতে চায়। উত্তর দিনাজপুরের মিলন মন্ত্রের চেয়েও বড় শক্তি ছিল সরার সেই মানবতা, যা সে প্রকাশের সুযোগ পায়নি। সেদিন জ্যোৎস্নারাতে ঝরনার ধারের সেই দৃশ্য সরার চোখে তুলে ধরেছিল তার নিজের অতীতকে। বোলপুরের সেই লোহার কল, সেই রেললাইন, আর সেই কালো পাথরের মতো নিটোল শরীরের জোয়ান মরদটি। সরা তার কথা মনে করে দুলতে থাকে। তার সেই সময়ের রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলছেন—

> “আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুটি ছোট, তারা দুটি খয়রা রঙের। কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বৈকি!”[৮]

উত্তর দিনাজপুরের লোক-সংস্কৃতিতে বিচ্ছেদ মন্ত্রের এক অদ্ভুত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ওঝারা যখন উচ্চারণ করেন—

> “তেলে আগল তেলে পাগল তেলের নাম জয়মঙ্গল এই তেল নাড়িয়া ফেন্নাক আন ধরিয়া ছাড়ো ফেন্না ফেন্নির পাশ...”[৯]

তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুটি হৃদয়ের বন্ধনকে ছিন্ন করা। তারাশঙ্করের ‘ডাইনী’ গল্পের সোরধনি বা সরা যেন এই বিচ্ছেদ মন্ত্রেরই এক জীবন্ত শিকার। সমাজ এবং নিয়তি তার জীবন থেকে একে একে সব প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সরার যৌবনের স্মৃতিতে যে পুরুষের অবয়ব ভেসে ওঠে, সে ছিল আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা এক বলিষ্ঠ মানুষ। বোলপুরের সেই পুকুরঘাটে তাদের প্রথম পরিচয়। সরা ছিল এক চঞ্চল কিশোরী। কিন্তু সেই কিশোরী বয়সেই তার কপালে জুটেছিল ডাইনী অপবাদ। সে যখন তার স্বামীর কথা ভাবে, তখন এক নিদারুণ হাহাকার ফুটে ওঠে। উত্তর দিনাজপুরের ‘ফলন মন্ত্রে’ যেমন প্রাচুর্যের কথা বলা হয়—

> “রাম আনিল বিচি লক্ষ্মণ করলে খেতি সীতাই দিলে বড় পাঁচ পইরি বুড়া বুড়ি গাছের ফল হালি ধর।”[১০]

সরার জীবনেও একসময় সুখের ফলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার সেই সংসারকে সমাজ শুষে নিয়েছে কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে। গল্পের ৪৮৪ পৃষ্ঠায় সরা তার অতীতের সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো রোমন্থন করে এই ভাবে—

> “সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি? ...ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়া-ছিল।”[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 94
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 751 - 756
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই যে রক্ত শোষণ করার ইচ্ছা, এটি আসলে একধরণের অবদমিত কামজ কামনা, যাকে সমাজ এবং সরা নিজে পরবর্তীতে ডাইনী বিদ্যা বলে ভুল বুঝেছে। উত্তর দিনাজপুরের লোক-বিশ্বাসে যেমন বিশ্বাস করা হয় যে মন্ত্রের জোরে মানুষকে পাগল করা যায়, সরাও তেমনই নিজের রূপ ও যৌবনের শক্তিকে এক ভয়ংকর জাদুকরী শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

উত্তর দিনাজপুরের মন্ত্রগুলোর মধ্যে এক ধরণের অধিকারবোধ কাজ করে। যেমন জাগানিয়া মন্ত্রে বলা হয়—

> “খসলার উপর তসলা তারপর মুই তারপর বিন্নামাদার পহর জাগাবো তুই।”[১২]

এখানে ‘মুই’ বা ‘আমি’র এক প্রবল উপস্থিতি আছে। কিন্তু সরার জীবনে এই আমি বড় একা। তার কোনো সন্তান নেই, পরিবার নেই।

গল্পের একটি করুণ দিক হলো সরার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। সে যখন শোনে যে সে একটা শিশুকে খেয়েছে, তখন তার অবচেতন মন অপরাধবোধে ভেঙে পড়ে। কিন্তু সমাজ তাকে সেই সুযোগ দেয় না। ঝরনার ধারে উজ্জ্বলা আর সেই বাউরী ছেলেটির প্রেম দেখে তার মনে করুণা জাগে। সে ভাবে, তার জমানো বিশ টাকার পুঁজি দিয়ে সে তাদের বিয়ে দেবে। সে নিজেকে প্রশ্ন করে—

> “তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? ...চল, তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।”[১৩]

এই যে ভালোবাসার আর্তি, তা উত্তর দিনাজপুরের মিলন মন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সরা জানে, সমাজ তাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। তাই সে যখন সেই ছেলেটিকে সাহায্য করতে যায়, তখন তার সেই ভালোমানুষি রূপটি কুৎসিত ডাইনী-মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। লেখক বলছেন—

> “দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।”[১৪]

এই প্রত্যাখ্যানই সরার ভেতরে থাকা ডাইনীকে আবার জাগিয়ে তোলে। উত্তর দিনাজপুরের বিচ্ছেদ মন্ত্র যেমন জোর করে সম্পর্ক ভাঙে, সমাজের এই আতঙ্কও তেমনই সরার মানবিকতার সাথে তার সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। ক্রোধে সে তখন সত্যিই অভিশাপ দিয়ে বসে— ‘মর-মর-তুই মর’।

উত্তর দিনাজপুরের পল্লী সমাজে আজও বিশ্বাস করা হয় যে ওঝারা বাণ মেরে মানুষকে শয্যাশায়ী করতে পারে, এমনকি মৃত্যু ঘটাতে পারে। গল্পের শেষ ভাগে আমরা দেখি, ছেলেটির অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে সেই একই ভয় কাজ করছে। তারাশঙ্কর অতি নিপুণভাবে লোক-মানসের এই অন্ধকার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন—

> “পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ...অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে।”[১৫]

বাস্তবে যা ছিল একটি সাধারণ চোট বা সংক্রমণ, মন্ত্রের প্রভাবে তা হয়ে উঠল অলৌকিক বাণ। উত্তর দিনাজপুরের ওঝারা যেমন দেহাবন্ধ মন্ত্র দিয়ে শরীর রক্ষা করে, গ্রামবাসীও তেমনই সরাকে বিনাশ করার জন্য গুণীনের শরণাপন্ন হয়। সরা তখন তার নিজের উঠানে একা ঘুরে বেড়ায়। তার চারদিকে জ্বলছে ছাতি-ফাটার মাঠ। এই মাঠটি যেন সমাজের সেই দহন যা সরাকে প্রতিনিয়ত পুড়িয়ে মারছে।

উত্তর দিনাজপুরের লোকায়ত বিশ্বাসে মাহাত কেবল চিকিৎসক নন, তিনি হলেন অশুভ শক্তির যম। যখন কোনো রোগ লৌকিক চিকিৎসার বাইরে চলে যায়, তখন মানুষ বিশ্বাস করে যে এর পেছনে কোনো ডাইনীর হাত আছে। তারাশঙ্করের গল্পে এই বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে যখন অসুস্থ ছেলেটিকে বাঁচাতে এক গুণীনকে নিয়ে আসা হয়। উত্তর দিনাজপুরের জাগানিয়া মন্ত্র যেমন রাতকে জাগিয়ে তোলে, গুণীনের আগমন তেমনই গ্রামবাসীর মনে এক ভয়ংকর প্রতিশোধ কামনা জাগিয়ে দেয়। সরা তখন তার জীর্ণ কুটিরে বন্দি। সে জানে বাইরের পৃথিবী তাকে খুনি হিসেবে রায় দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো তার নিজের স্মৃতি। সে তার মৃত স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদে

ওঠে। উত্তর দিনাজপুরের বিষ দূর করার মন্ত্রে যেমন পীর আর হনুমানের দোহাই দেওয়া হয়, সরা তেমনই তার ফেলে আসা প্রেমের দোহাই দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু লোকবিশ্বাসের শেকল অনেক শক্ত। লেখক তাই বলেছেন—

> "যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনোদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা!"[১৬]

সরার এই আত্মগ্লানিই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সে বুঝতে পারে, এই সমাজে বেঁচে থাকা মানেই প্রতিনিয়ত ডাইনী অপবাদ বয়ে বেড়ানো। উত্তর দিনাজপুরের ফলন মন্ত্র যেখানে সমৃদ্ধি আনে, সরার জীবন সেখানে কেবলই মৃত্যু আর শ্মশানের ধুলোবালি। কালবৈশাখীর সেই প্রলয়ংকরী সন্ধ্যায় সরা যখন তার ছোট্ট পুঁটলি নিয়ে ছাতি-ফাটার মাঠে নামল, তখন প্রকৃতিও যেন তার ধ্বংসের জন্য মন্ত্র পাঠ শুরু করল।

গল্পের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ। উত্তর দিনাজপুরের লোক-ওঝারা যেমন মনে করেন তারা মন্ত্র দিয়ে ঝড় বা বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, গল্পের গ্রামবাসীও তেমনই বিশ্বাস করল যে সরার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ঝড়ের রাতে সরা যখন পালাচ্ছিল, তখন তার সেই ছুরির মতো চোখ দুটির বর্ণনা দিয়ে লেখক বলছেন আকাশের বায়ুকোণটি তার চোখের তারার মতোই খয়েরি রঙের হয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে মাঠের প্রান্তে এক কণ্টকাকীর্ণ গাছে বিদ্ধ হয়ে থাকা সরার মৃতদেহটি দেখে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা উত্তর দিনাজপুরের লোক বিশ্বাসের এক চরম দলিল—

> "শাখাটার তীক্ষাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে।"[১৭]

এখানেই গল্পের সার্থকতা এবং লোক-বিশ্বাসের ভয়ংকরতা। সরা যে একটি ঝড়ে হোঁচট খেয়ে কাঁটাগাছে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে – এই সহজ সত্যটি গ্রহণ করার ক্ষমতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নেই। তারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যে এটি গুণীনের মন্ত্রপ্রহার। এমনকি তারা সরার রক্তকেও কালো রক্ত বলে অভিহিত করল। লোকমুখে প্রচারিত হল—

> "অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।"[১৮]

উত্তর দিনাজপুরের সেই সংগৃহীত মন্ত্রগুলো– তা সে নারী-পুরুষ মিলন মন্ত্র হোক বা 'বিষ পাতালে যাওয়ার আর্তি– সবই মানুষের অসহায়ত্ব আর আকাঙ্ক্ষার ফসল। সুভাষ মিস্ত্রী যে মন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অমোঘ শক্তি মানুষের উপকারে লাগার কথা ছিল। কিন্তু তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পে আমরা দেখলাম, সেই একই বিশ্বাস কীভাবে একজন মানুষকে 'রাক্ষসী' বানিয়ে দেয়। পল্লব সেন গুপ্ত মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন যে, এই বিশ্বাস আজও আমাদের মনের গুপ্তকোণে বাস করে। উত্তর দিনাজপুরের ওঝাদের সেই অদ্ভুত লোকভাষার মন্ত্রগুলো আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হতে পারে, কিন্তু সেই মন্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাস যখন 'ডাইনী' গল্পের মতো কোনো নিরপরাধ বৃদ্ধার রক্ত চায়, তখন তা হয়ে ওঠে এক সামাজিক ব্যাধি। সরার মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই শকুনির পাল আজও আমাদের সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা মানুষের অসহায়তাকে পুঁজি করে কুসংস্কারের কারবার চালায়।

Reference:

১. চৌধুরী, দুলাল এবং পল্লব সেনগুপ্ত, লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৩, পৃ. ৫১৬
২. চৌধুরী এবং সেনগুপ্ত, পৃ. ২১১
৩. দাস, কুঞ্জ মোহন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাম : দাড়িয়া গছ, উত্তর দিনাজপুর, মার্চ ২০২৫
৪. দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
৫. দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
৬. দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), ২য় মুদ্রণ, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৮৯, পৃ. ৪৮৩

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৩

৯. দাস, কুঞ্জ মোহন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

১০. দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৪৮৪

১২. দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৪৮৬

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৭

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৮

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৮

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৯

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮৯

Bibliography:

রায়, ধনঞ্জয়, দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬ [পৃষ্ঠা ৫]

ঘোষ, ডক্টর বৃন্দাবন, উত্তর দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, দার্জিলিং : নিবন্ধন (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), ২০২০

চৌধুরী, দুলাল এবং পল্লব সেনগুপ্ত, লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৩

ভট্টাচার্য, ড. শ্রী আশুতোষ, লোক-সংগীত রত্নাকর (প্রথম খন্ড), কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭ (বঙ্গাব্দ)।

চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতির সুলক সন্ধানে, কলকাতা : বুক ট্রাস্ট প্রকাশনী, ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশো দশ বছর (১৮৯১-২০০০), ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪